

মুখের ভাষা, বিজ্ঞাপনের ভাষা

অমরকুমার পাল

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/8_Amar-Kumar-Pal.pdf

সারসংক্ষেপ: সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষাভেদ পরিলক্ষিত হয়, কারণ ভোক্তাকে বিজ্ঞাপিত বস্তু বিক্রি করা বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্য। তাই স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ভাষিককৌশল অবলম্বন করতে হয় ব্যবসায়ীকে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের শ্রোতাকে মনের ভাব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য, তাই ব্যবসায়িক বুদ্ধি না থাকায় সেখানে ভাষিককৌশল উদগ্রহ হয়ে ওঠে না। বর্তমান প্রবন্ধে মুখের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষার প্রভেদ আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: বিজ্ঞাপন, ভাষিককৌশল, বন্ধুবৎসল, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়।

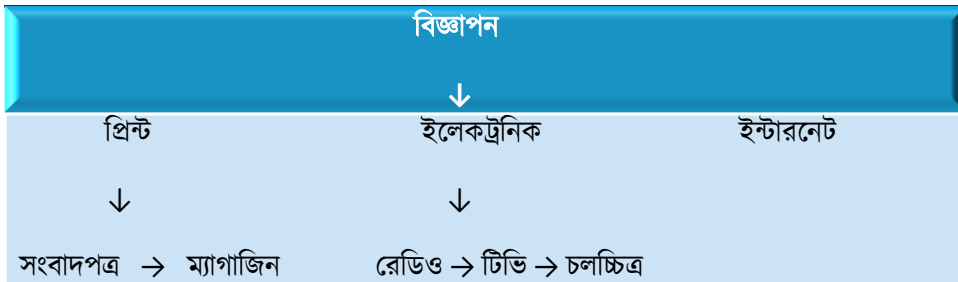
মানবসভ্যতার অকল্পনীয় অগ্রগতির পেছনে কোন্ সৃষ্টি কিংবা আবিষ্কারের ভূমিকা সর্বাধিক? এই প্রশ্ন করা হলে, আমরা নানান জনের কাছে নানান রকমের উত্তর পেয়ে থাকি। কেউ বলেন আগুন, কেউবা বলেন কৃষিকাজ, একদল বলেন লোহা, অপরদল বলেন বিদ্যুৎ। আবার বর্তমান সময়ের নবীন প্রজন্মেরা বলেন ইন্টারনেট। মতানৈক্যের শেষ নেই। কিন্তু আমাদের মতে মানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো ভাষা। ভাষা ব্যতীত মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যেত। কেননা আমরা একে অপরের মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম না হলে রকেট আবিষ্কার তো দূর অস্ত, নিজেদের রক্ষা করার কৌশলও আবিষ্কার করতে পারতাম না। প্রসঙ্গাত, মনে পড়ে ‘টাওয়ার অফ ট্রাভেল’ এর বহুল প্রচলিত মিথটির কথা। মানুষেরা যখন স্বর্গে পৌঁছানোর জন্যে টাওয়ার নির্মাণ করে অনেক অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বর মানুষের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি সেই নির্মাণে যুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের ভাষাকে আলাদা করে দেন। ব্যস, নির্মাণকার্য ওইখানেই থমকে যায়। কারণ, শ্রমিক-ইঞ্জিনিয়ারেরা একে অপরের মনের ভাষা বুঝতে অপারগ হয়ে যায়। আর এই ধরনের গঠনমূলক কাজে একে অপরের মনের ভাব বুঝতে পারাটা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। আমরা পূর্বে কেন মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে ভাষাকে চয়ন করেছি, তা এই মিথের কাহিনিটি সাক্ষ্য দিয়ে দেয়।

‘আমি যা কিছু বলিবারে চাই, বলিতে দিতেছ কই / অন্তরমাঝে বসি অহরহ, মুখ হতে তুমি ভাষা কাড়ি লহ’ (অন্তর্যামী, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ) মনের গহন-নিগূঢ় ভাবকে প্রকাশক্ষম শব্দ নির্বাচন করে ভাষার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণ বিকশিত করতে না পারার আক্ষেপ বিধৃত হয়েছে এখানে। অর্থাৎ কিনা আমরা যা বলতে চাই তা বোঝানোর শ্রেষ্ঠতম উপাদান হলো ভাষা। মানুষের এই মুখের ভাষা সহজাত নয়, তা অর্জন সাপেক্ষ। ভাষার এই অর্জন ঘটে থাকে বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে। ফলে ভাষার সঙ্গে সমাজের একটি দুর্নিরীক্ষ্য সম্পর্ক গ্রন্থনা হয়ে যায়। সমাজ ‘কর্তার ভূতে’র ন্যায় অদৃশ্য থাকে ঠিকই, কিন্তু তা আমাদের ঘাড়ে সবসময়ই চেপে থাকে। সমাজই আমাদের বলে দেয় কোথায় কী বলতে হবে। কোথায় প্রয়োগ করব সতর্করীতির ভাষা, আর কোথায় অসতর্করীতির। আর তারই ফলে বিয়েবাড়ির ভাষার সঙ্গে শ্রাদ্ধবাড়ির ভাষায় ঘটে যায় প্রভেদ। মুখের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষার সূচিত হয় পার্থক্য। সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে গেলে, বলতে হয় মুখের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষাভেদের অন্যতম কারণ হলো, দুই ক্ষেত্রে বক্তার লক্ষ্য অভিন্ন হয় না। ভোক্তাকে বিজ্ঞাপিত বস্তু বিক্রি করাই থাকে বিজ্ঞাপনদাতার একতম উদ্দেশ্য। তাই বিজ্ঞাপনদাতাকে স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে নানান ভাষিককৌশল অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ উদ্দিষ্ট শ্রোতাকে মনের ভাব প্রকাশেই অধিকতম জোর দিয়ে থাকেন। ব্যবসায়িক হিসেবি বুদ্ধি সেখানে সর্বদা না থাকায় ভাষিককৌশলও

উদগ্র হয়ে ওঠে না।

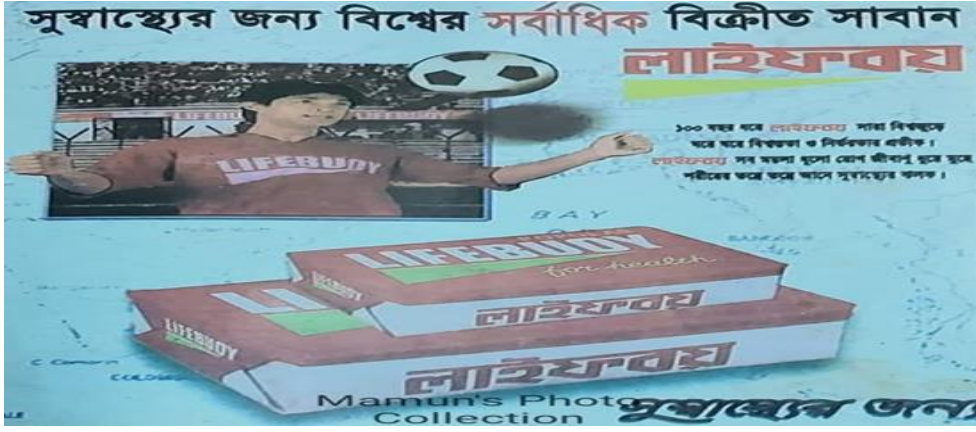
বিজ্ঞাপনের ভাষার প্রসঙ্গা উত্থাপিত হলেই মনে পড়ে, শঙ্খ ঘোষের সেই তাৎপর্যবাহী অমোঘ উচ্চারণ ‘একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি / তোমার জন্যে গলির কোণে / ভাবি আমার মুখ দেখাব / মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, শঙ্খ ঘোষ) ব্যক্তির কী গভীর সংকট! কাউকে মুখ দেখাবার জো নেই আর। অথচ আমরা জানি যে, মানুষের মুখ হচ্ছে তার মানসিক দর্পণ। তার অন্তর্নিহিত ক্ষতের-রভসের শৈল্পিক আভরণ। সেই মুখ বিজ্ঞাপনের বাহারে বিচ্ছিন্ন ব-দ্বীপে বাস করে আজ। আর জেলাশহরে দাপটে বিরাজিত হন বিজ্ঞাপন। যেই বিজ্ঞাপনের অনেকটাই আচ্ছাদিত থাকে বহুস্তরীয় মিথ্যাচারিতায়, পরিণত প্রলোভনে। বনফুলের ‘ক্যানভাসার’ গল্পের হীরালাল তো বিজ্ঞাপনের জগতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যিনি দাঁতের মাজন বিক্রেতা। যা ব্যবহার করলে ‘দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ’ সব ভালো হয়ে যাবে মশাই।’ সঙ্গে তিনি কলপও রাখেন। কিন্তু ক্ষিপ্ত ভৈরবের সপাটে চড় খাওয়ার পর তার বাঁধানো দস্তপাটি ছুটে বেরিয়ে আসলে জানা যায় তার সমস্ত দাঁতই নকল। এমনকি তার কালো কুচকুচে গোঁফজোড়াটিও। যিনি দাঁতের মাজন ও কলপ বিক্রি করেন তার দাঁতই বাঁধানো এবং গোঁফটিও নকল! গল্পকার বিজ্ঞাপনের জগতের যে ফাঁপা নগ্ন সত্য তা সূচারুভাবে রেখায়িত করেছেন এই গল্পে।

বিজ্ঞাপন শব্দটির ইংরেজি হলো এডভারটাইজ। শব্দটির উৎস ল্যাটিন ‘এডভারটার’। যার অর্থ হলো ‘আবর্তিত করা’। সম্ভাব্য ভোক্তাকে আকর্ষিত, প্রভাবিত ও আবর্তিত করতে হয়। এবং বলাবাহুল্য এই আকর্ষিত করার বিষয়টি বহুলাংশে নির্ভর করে ভাষার উপর। বর্তমান সময়ের বিজ্ঞাপনের জগৎকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায় —



বিজ্ঞাপনের গানকে বলা হয় জিংগল। সাতের দশক থেকে রেডিয়োয় প্রথম বাংলা বিজ্ঞাপনী গান প্রচারিত হতে থাকে। ১৯৭৫ থেকে টি.ভি.তেও ভিড় করে বিজ্ঞাপন। শ্রাবস্তী মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপনী গান গেয়ে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিলেন একসময়। বিজ্ঞাপনের গানে মূল আকর্ষণীয় বিষয়টি হলো কথা ও সুর। ‘লাইফবয় যেখানে, স্বাস্থ্য সেখানে’, কিংবা ‘সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন’ — আজও আপামর বাঙালি গুনগুন করেন। একই পণ্যের বিজ্ঞাপনে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোক্তাকে প্রমুখিত করার ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনের জগতেও মুখের ভাষা ও লেখার ভাষায় যে প্রভেদ থাকে, তা নিম্নে প্রদর্শিত চিত্র দুইটি প্রমাণিত করে। প্রিন্টে অনেক কিছু বেশি লেখা থাকে, তা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বলা হয় না। সেখানে শারীরিক ভঙ্গিও ভাষার ভূমিকা পালন করে থাকে।





অডিও-ভিসুয়াল বিজ্ঞাপনে সুর ভোক্তার মনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। সুরের একটি ধর্মই হলো শ্রোতাকে তা দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুরণিত করা। গুনগুন করতে করতে ভোক্তা নিজেও বুঝতে পারেন না তিনি কখন সেই পণ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। ‘ডাকঘর’ নাটকে অমল তাইতো দইওয়ালার কাছে দই বিক্রির যে হাঁক, তার সুর শিখতে চেয়েছিল —

“অমল। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই — ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।
দইওয়াল। হায় পোড়াকপাল। এ সুর কি শেখাবার সুর।
অমল। না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে।”^৩

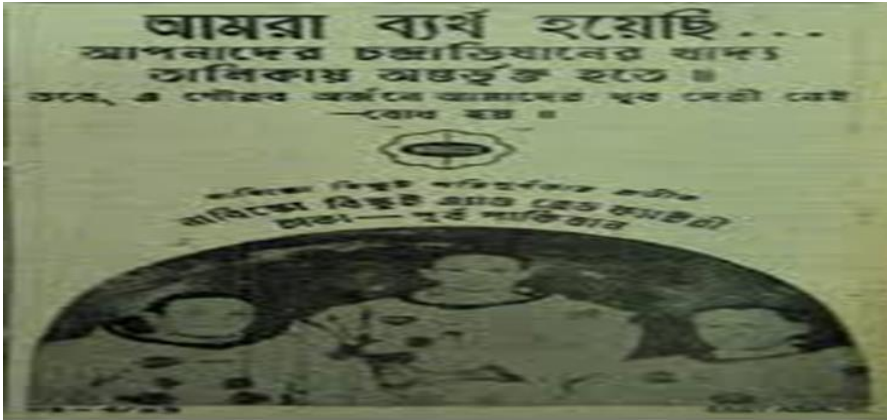
সুর শুনতে যে আমাদের সকলেরই ভালো লাগে সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিজ্ঞাপনে সুরারোপ করা হয়।

বিজ্ঞাপনে যে সমস্ত উপায়ে ভোক্তাকে আকৃষ্ট ও আবর্তিত করা হয় তার একটি হলো তথ্য প্রদান। ‘ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান টু হুইলার’ কিংবা ‘আপনার টুথপেস্টে কি নুন আছে?’— এই বিজ্ঞাপনগুলোতে ভোক্তাদের কিছু তথ্য দিয়ে প্রমুখিত করা হয়। ‘ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান’ কথাটিতে চালাকি লুকিয়ে থাকে। কোন্ বিষয়ে নাম্বার ওয়ান, তা সঠিকভাবে বলা হয় না। বিক্রির দিক থেকে হলে, সেই সমীক্ষাকে করেছে তাও বলা হয় না। শুধু বলা হয়, ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান। আর এই নাম্বার ওয়ানের পরিসংখ্যানগত তথ্য পেয়ে ভোক্তারা ভরসা পান পণ্যটির উপর। নিশ্চয় ভালো, তাই এত বিক্রি হয়েছে। সুতরাং আমিও কিনতে পারি। অথবা কিনলে এইটাই কিনতে হবে। ‘টুথপেস্টে নুন’ থাকার বিজ্ঞাপনটিও চমকপ্রদ। আসলে তারা বলতে চান যে, আমাদের পেস্টে নুন আছে কিন্তু অন্যান্যদের পেস্টে নেই। আর নুন দাঁতের পক্ষে উপকারি। সুতরাং আপনাদের এই নুন দেওয়া পেস্ট অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। গ্রাহক চিন্তিত হয়ে পড়েন এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে। নুনবিহীন পেস্ট ব্যবহার করা তার উচিত হচ্ছে না হয়ত! এতদিন যা ভুল করেছেন, তা এবারে শুধরে নেওয়া উচিত। এইভাবে তথ্য দিয়ে বিজ্ঞাপন মানুষকে বোকা বানায়। একটি ওষুধ কোম্পানি কোভিডের সময় এইভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে, দুর্বল শরীরে করোনা ভাইরাস দ্রুত আক্রমণ করে। সুতরাং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তারা যেন এক চামচ তাদের ভিটামিনসমৃদ্ধ ফাইল খেয়ে ঘুমোতে যান। তথ্যের মধ্যেই চতুরতা গুপ্ত থাকে। তথ্য দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে ভোক্তাকে পণ্য ব্যবহারে বাধ্য করা হয় এইভাবে। এই ধরনের কোম্পানিগুলো অনেক সময় তাদের যুক্তিকে সত্যনিষ্ঠ করে তুলতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন।





বিজ্ঞাপন কী শুধুই প্রচারকৌশলে সীমাবদ্ধ? তার মধ্যে কী নান্দনিকতা, শৈল্পিকতা থাকে না। সে কী শুধু ভালো ভালো ইতিবাচক কথাই প্রচার করে? না, তা একেবারেই নয়। শুধু ইতিবাচকতা নয়, অনেক সময় নেতিবাচক বার্তা দিয়েও পণ্যবিক্রির বিজ্ঞাপনের ভাষা তৈরি হয়। এই ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল নাবিস্কো বিস্কুট কোম্পানি। তারা ১৯৬৯ সালে একটি বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, ‘আমরা ব্যর্থ হয়েছি... আপনাদের চন্দ্রাভিযানের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে। তবে, এ গৌরব অর্জনে আমাদের খুব দেরী নেই — বোধ হয়।’ নীচে থাকত প্রথম চন্দ্রাভিযানের ১৯৬৯ সালের ছবি। কী চমৎকার শৈল্পিক বিজ্ঞাপন ছিল তা! ব্যর্থতার কথা বলেও যে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা যায় তা নাবিস্কো আমাদের শিখিয়েছিল।



বিজ্ঞাপনের জগতে আলোড়ন ফেলেছিল একসময় পিয়ার্স সাবান। তারাই প্রথম সেলিব্রিটি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করেন। জে ব্যারাট ছিলেন সেই ভাবনার হোতা। তিনি গায়িকা লিটল ল্যাংট্রিকে পিয়ার্স সাবানের মডেল করেছিলেন। তাই ব্যারাটকে আধুনিক বিজ্ঞাপনের জনক বলা হয়। পাশ্চাত্যের সেই ভাবনা প্রাচ্যেও এসে আছড়ে পড়ে। আর তখন এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড়ো মডেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই তাঁকে প্রচুর বিজ্ঞাপন লিখতে হয়েছিল। অনেক বিজ্ঞাপনে তাঁর ছবিও ব্যবহৃত হতো। ভারতবর্ষের বর্ণা কলমের বিখ্যাত কালি কোম্পানি ‘সুলেখা’র জিংগল গুরুদেব, বন্ধু হেমেন্দ্রমোহন বসুর অনুরোধে স্বয়ং লিখে দিয়েছিলেন — ‘সুলেখা কালি। এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।’ হেমেন্দ্রমোহন বসুর ছিল মাথায় মাখা কুন্তলীন তেল, পান মশলা এবং সুগন্ধির ব্যবসা। তাঁর বিবিধ পণ্যের বিজ্ঞাপন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা দিয়ে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল — “কেশে মাখো ‘কুন্তলীন’ / বুমাতে ‘দেলখোস’ / পানে খাও ‘তাম্বুলীন’ / ধন্য হোক এইচ বোস”। আর ‘বর্ণ ভিটা’র বিজ্ঞাপনে তো রবীন্দ্রনাথের সনদপত্র থাকত।

আমি পূর্বে যে বিদ্যালয়ে চাকরি করতাম সেই বিদ্যালয়ে একদিন একজন বহুরূপী ফেরিওয়ালা এসেছিলেন। তাঁর পোশাক ছিল ভারতীয় সেনার। চুলের কাটও ছিল সেনার। এসে তিনি জানান যে, তিনি আর্মির গাড়ির ড্রাইভার। কোন্ ক্যাম্পের তা বলা বারণ। তিনি কিছু মিস্টার গ্রাইভার ক্যাম্প থেকে খুবই সস্তায় নিলামে কিনেছেন। সেগুলি জলের দরে বেচতে চান। সফলও হয়েছিলেন তিনি তাঁর চতুরতা দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে। তাঁর পণ্যবিক্রি করার ভাষা লুকিয়ে ছিল পোশাক এবং চুলের কাটে। সেনার প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা ও আবেগ তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর পণ্য বিক্রি করেছিলেন। অর্থাৎ শুধু শব্দ, সুর, তারকা নয় অনেকসময় পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে কোনো বিশেষ ভাবাবেগকে উস্কে দিয়েও পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন তৈরি হয়। সহানুভূতি অর্জনের মাধ্যমেও পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন তৈরি হয় অনেকসময়। চটকলের শ্রমিক ছিলাম বন্ধ হয়ে গেছে তাই ধূপকাঠির ব্যবসা করে সংসার চালাই। এই ধরনের সহানুভূতি অর্জন করা ফেরিওয়ালা ট্রেন-বাসে অহরহ দেখা যায়। একবার আমরা সপরিবারে বাইকে ফিরছিলাম। রাস্তার মাঝে এক যুবক হঠাৎ পথ আটকে আমাদের দাঁড় করান। বাইক এবং কারের টেফলন পলিস বিক্রি করছিলেন তিনি। আমরা তাঁর পণ্য কিনতে কিছুতেই রাজি হই না। কারণ বাইক আমি গ্যারেজে দিয়ে ওয়াশ করাই। কিন্তু যুবকটি যখন বলেন ‘দাদা আমি এম.এ, বি.এড.। চাকরি নেই। এই ব্যবসা করেই পেট চালাই।’ তখন আমরা কিনেছিলাম তাঁর পণ্য। জানিনা তিনি সত্যি বলেছিলেন, না মিথ্যে। কিন্তু তিনি তাঁর পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপনে সহানুভূতি অর্জনের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন।

অফারের প্রলোভন দেখিয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন তৈরির বহু নমুনা রয়েছে। ব্র্যান্ডেড পণ্যের শোরুমে মধ্যবিত্ত খদ্দেররা প্রবেশ করতে ভয় পান। তাই তাদের সুদৃশ্য কাচের দরজায় বড়ো বড়ো করে লেখা থাকে ‘ফিফটি টু সেভেনটি পারসেন্ট অফ’। জুয়েলারির দোকানে প্রায়ই দেখা যায় ‘হিরের গয়নায় ৫০শতাংশ ছাড় এবং সোনার মজুরিতে বিশেষ ছাড়’। শপিং মলগুলিতে লেখা থাকে ‘একটির সঙ্গে আরেকটি ফ্রি’ ইত্যাদি। গ্রামের ফেরিওয়ালারাও বর্তমানে এই কৌশলগুলি শিখে গেছেন। তাই তারা গরমের মরসুমে কস্মল বিক্রি করতে আসেন এখন। আর প্রথমেই বলেন ষ্টক শেষ করে বাড়ি ফিরে যাবেন, তাই খুবই কম দামে দেবেন তার কস্মল। আসলে সেটিও ব্যবসার একটি কৌশল। খোঁজ নিলে জানা যায়, তিনি পুরো গরমের মরসুমেই কস্মল বিক্রি করেন। মানুষকে ষ্টক শেষ করার কথা বললে সস্তায় পাবার আশায় অনেকে তা দেখেন এবং কেনেন।



ছাড়ের বিজ্ঞাপনে ‘ধামাকা’ ‘মহা’ রূপিমগুলির প্রচলন খুবই বেশি। গ্রাহককে সেই পদগুলি চুষকের মতো আকৃষ্ট করে। ইন্টারনেটের যুগে বিজ্ঞাপনের বহর ও বাহার সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আপনি বাস, ট্রেন কিংবা প্লেনের টিকিট কাটতে গেলেও হাজারটা বিজ্ঞাপন এসে হাজির হয়ে যায়। আপনি সার্চ ইঞ্জিনে কী সার্চ করছেন তা জেনে, আপনার মানসিকতা বুঝে আপনার কাছে অসংখ্য পণ্যের বিজ্ঞাপন তার পূর্ণডালি নিয়ে হাজির হয়ে যায়। কী ব্যঞ্জনাময় তাদের ভাষা, কত সুন্দর তাদের প্রমুখিত শক্তি। ডেটিং সাইটগুলি বিজ্ঞাপন দেয় এইভাবে — ‘আপনি কী একা? একাকীত্ব বোধ করছেন? মনের মতো বন্ধু খুঁজছেন? রাতের নিঃসঙ্গতা কাটাতে চান? তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল দিন। আমরা আপনাকে দেবো স্বর্গসুখ।’ প্রলোভিত করার কী অনিন্দ্যসুন্দর কৌশল! লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী এইসব ফাঁদে পা দিচ্ছেন শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের ভাষাগুণে।

বিজ্ঞাপনে লুকিয়ে থাকে অনেক সামাজিক ইতিহাস। ‘ফেয়ার এন্ড লাভলি’র নাম বর্তমানে হয়েছে ‘গ্লো এন্ড লাভলি’। বিজ্ঞাপনের জগতে ‘ফেয়ার’ শব্দটিকে বিশ্বব্যাপী বর্জন করা হয়েছে আমেরিকার ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ (২০১৩) আন্দোলনের পর থেকে। কয়েকদিন আগে পাত্র চাই বিজ্ঞাপনে দেখলাম এক চমকে দেওয়ার মতো ভাষা। সেখানে পাত্রীর অভিভাবক পরিস্কারভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, ‘স্কুল শিক্ষক ব্যতীত’ পাত্রই তিনি চান। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষকদের চাকরি চলে যাওয়ার ইতিহাস কী নিদারুণ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে বিজ্ঞাপনে!

■ পাত্রী সাহা, 32/4'-8", B.A.
(H), সুশ্রী, সং চাকরিরতা,
কর্মস্থল-ধূপগুড়ি, নিজবাড়ি-
উত্তর দিনাজপুর। উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন,
সং চাকরি, উপযুক্ত পাত্র কাম্য
(স্কুল শিক্ষক ব্যতীত)। (M)
5, সময় রাত্রি 8 P.M.
থেকে 10.30 P.M. (C/10/7)

বইয়ের বাজারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যান্ড নাম ব্যবহার করে। যেমন, সেরা ভূতের গল্প, সুনীল গজোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সহ। এখানে সুনীল গজোপাধ্যায়ের নামটি ব্যবহৃত হয়েছে বিজ্ঞাপনের জন্যে। বাংলা-ইংরেজি ব্যাকরণ প্রভৃতি স্কুল পাঠ্য বই, কিনে নিতে হয়, বিখ্যাত ভাষাবিদদের কিংবা সমালোচকদের নামে প্রকাশ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেইসব লেখকরা জানেনই না যে, তাঁদের নামে বই বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। লোকাল জলের বোতলে যেমন ঋত্বিক রোশন, ক্যাটরিনা কাইফের ছবি ব্যবহার করা হয়, তেমনি আর কী! শারদ পত্রিকাগুলি তো জনপ্রিয় লেখকদের নাম প্রচ্ছদেই ছাপিয়ে বিজ্ঞাপিত করে থাকে। প্রচ্ছদ দিয়েও বাজিমাত করার কৌশল বহুদিনের। ‘বনলতা সেন’ কাব্যের প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ের করা। তবে বর্তমানে বিখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী নয়, আদি রসাত্মক সাহসী প্রচ্ছদ দিয়ে বিজ্ঞাপিত করা হয় অনেকক্ষেত্রে। অনুপম মুখোপাধ্যায়ের ‘হত্যাবৃত্ত’ উপন্যাসের প্রচ্ছদটি যে ভীষণ আকর্ষণীয়, তা আমাদের এক পাঠক জানিয়েছিলেন। পাঠকটির মতে, সেইজন্যেই উক্ত উপন্যাসটির এত বিক্রি!

জি.আই ট্যাগ বিজ্ঞাপনের জগতে খুবই জনপ্রিয়। আমরা পাটনা শহরেও দেখেছি ‘কলকাতা বিরিয়ানি হাউস’, শিলিগুড়িতে দেখেছি ‘গজারামপুরের দই’ নামক দোকান। এখানে বিজ্ঞাপনের ভাষা তৈরি হয় স্থানকে কেন্দ্র করে। যেমন, দার্জিলিংয়ের চা, জয়নগরের মোয়া, বর্ধমানের মিহিদানা, রায়গঞ্জের তুলাইচাল, মালদার আম, কলকাতার রসগোল্লা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, চম্পারনের হাণ্ডি মটন, দিল্লির লাড্ডু, কাটোয়ার ডাটা, বিঘোরের বেগুন, হিলির পটল প্রভৃতি। দোকানদার এইসব ক্ষেত্রে লোকাল পণ্য বিক্রি করলেও জি.আই ট্যাগ পাওয়া স্থানগুলির নাম প্রয়োগ করে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করেন। পাত্র-পাত্রী চাই জগতের ভাষা তো আলাদাভাবে চর্চার দাবি করে। সেখানে মুন্ডমাল শব্দ, সংক্ষেপিত শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কারণ প্রত্যেক ক্যারেক্টার অনুযায়ী পত্রিকা কর্তৃপক্ষ টাকা নিয়ে থাকেন। সুতরাং যত কম কথায় যত বেশি বলা যায়, ততই লাভ সেখানে। যেমন, সংঃ= সরকারি চাকরি, পূঃবঃ= পূর্ব বঙ্গীয়, কলি=কলিকাতা, সং/অসং=নিজবর্ণ/অন্যবর্ণ প্রভৃতি। এই জগতে ফর্সা, স্লিম, নামমাত্র ডিভোর্সি, দাবিহীন, সংসারী প্রভৃতি শব্দগুলির প্রচলন খুব বেশি।

বিজ্ঞাপনের জগতের ভাষাশৈলী নিয়েও কিছু বলা দরকার। মূলত অনুপ্রাস এবং উপমা অলংকারের প্রয়োগ আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষায় লক্ষ করেছি। ‘পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি’ (গোল্ড ফ্লেক), ‘পড়তে হয়, নইলে পিছিয়ে

পড়তে হয়’ (আনন্দবাজার পত্রিকা), ‘ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় পায় না’ (বর্তমান পত্রিকা), ‘সুলেখা কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো (সুলেখা কালি)’— দৃষ্টান্তগুলিতে একই পদ কিংবা বর্ণ বারংবার ব্যবহার করে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। ‘মধুর মতো মিষ্টি, তুলোর মতো নরম, গোলাপের মতো সুগন্ধ’ (বরফ), ‘লাঙলের মতো চষে দিচ্ছে হুঁদুর’ (হুঁদুরমারা বিষ) কী সুন্দর উপমা অলংকারের প্রয়োগ করেন বিক্রেতারা। কিছু ক্ষেত্রে ছন্দের আকারে অন্ত্যমিল দিয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন করা হয়। এই প্রবণতাটি দেখা যায় মূলত মেলায় হরেকমালের দোকানে। তারা বলেন, ‘আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে টিয়া / আমাদের দোকানের জিনিস কিনুন, মাত্র দশ টাকা দিয়া’, কিংবা ‘কাক কালো, কোকিল কালো, কালো মাথার চুল / আমাদের দোকানের জিনিস না কিনলে, করবেন বড় ভুল’। শ্রুতিমধুর এই বিজ্ঞাপনগুলি আজও মেলাবাজারকে মাতিয়ে রাখে। আর এইভাবেই মুখের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষার স্বতন্ত্রতা তৈরি হয়ে যায়। নির্মিত হয় বিজ্ঞাপনের জগতেরও এক বৈচিত্রময় ভাষিকজগৎ।

তথ্যসূত্র:

১. ‘ক্যানভাসার’, ‘বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প’, বনফুল, চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ ২০০৬, পৃ. ৫৪
২. ‘বাংলা ভাষা ও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস’, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, জুলাই ২০১৪, পৃ. ২৬
৩. ‘ডাকঘর’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ’, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪২৬

লেখক পরিচিতি: অমরকুমার পাল, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জানকী দেবী উইমেনস্ কলেজ, পাটনা।